

টিচিং টুংকা

ড. শামস্ রহমান

জুন-জুলাইয়ের কনকনে শীতে এক মহিলা প্রতিদিন ভোরে হাঁটে। এলিজাবেথ সড়ক ধরে পূর্বে-পশ্চিমে একবার যায়, আর একবার আসে। এবং এভাবে অনেকবার। পরনে তার অদ্ভুত পোশাক। কাঠমুন্ডুর স্কি টুপিতে চুল ও কপাল সযত্নে ডাকা। নাতিদীর্ঘ গ্রীবা, যা অসংখ্য ভাজে কাশ্মীরী-ক্যাশমেয়ার শালে স্কাউটের এক বিশেষ গিটঠুতে বাঁধা। কোমরে গোজা টাঙ্গাইল শাড়ি, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তোলা। পায়ে জড়ানো লম্বা মোজায় দৌড়ের নাইকি সু। বিনিটন র-ে আর বহুজাতিক পোষাকে এলিজাবেথ সড়কের ক্যাট-ওয়াকে সে এক ভিন্ন ধরনের মডেল। এ সাজেই সেজে সে প্রতিদিন ভোরে হাঁটে।

নাম তার টুংকা। কেমন এক নাম! শোনা যায় না সচরাচর। এ নামের কি মানে, টুংকা কি তা জানে? বহু অনুসন্ধানও উদ্ধার হয়নি আজ অন্দি। হয়তো ছোট্ট দুই মেয়েটি লুকিয়ে রাখা মায়ের কাঁচের চুড়ি পরে টুং টুং শব্দে এ বাড়ি ও বাড়ি করতো; তাই তার নাম টুংকা। তার বাবা আদর করে ডাকতো টুংকা বুড়ি।

আজ সে সত্যিই টুংকা বুড়ি। এ বছর ৭৫ থেকে ৭৬'এ পরেছে। জন্ম তার টাঙ্গাইলে, প্রসিদ্ধ মিষ্টি চমচমের জন্মভূমি পোড়াবাড়ির পাশের গাঁ মাটিকাটায়। কানে খাটো। চোখে দূরে-কাছে দেখে অস্পষ্ট। রক্তের চাপ আছে, তবে ওষুধে নিয়ন্ত্রণে। স্বীকার্য যে, শর্করার মাত্রা ওঠা-নামা করে; তবে গড়ে, ভোরের হাঁটায় আর আহারের অভ্যাসে নিয়ন্ত্রণে থাকে। এসব নিয়ে বেশ আছে বলা যেতে পারে।

টুংকার গায়ের রং কালো। দৈর্ঘ্যে খাটো। অতি গর্বে বলতো - সে চার ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি। সাড়েটা না বললে, সেরেছে! সে অবশ্য কৈশোরে-যৌবনে। বয়সের ভারে টুংকা এখন হয়তো আরও এক থেকে দেড় ইঞ্চি খাটো। তবে এ সব নিয়ে আজ আর তার মাথা ব্যথা নেই। মোট কথা, গায়ের রং, উচ্চতা আর গড়নে টুংকা ড্রাভিডিয়ানের এক উজ্জ্বল ছবি।

ছোট্ট বেলা থেকেই টুংকা বড় হয়েছে স্বল্প বাহারের টাঙ্গাইল শহরে। সে সময় দু'কদম না যেতেই, উত্তরে ঘন বন; পশ্চিমে নদী। শহরের কাঁচা রাস্তায় কাদা আর টমটম গাড়ির ভিড়। সন্তোষের জমিদারের পাঁচ আনি বাজারের অলি-গলিতে চমচমের দোকান; আর ছয় আনি বাজারের শাড়ি-লুঙ্গি ও স্বর্ণকারের অলংকারের ঘর। এইতো শহর। ঘরে সন্ধ্যা বাতি জ্বলার আগেই জ্বলে উঠতো জোনাকির আলো।

ঝুমুর, চন্দনা, গৌরী - মূলত: এরাই ছিল টুংকার সখি। বর্ণমালা শেখার আগেই এদের সাথে গড়ে উঠে সখ্যতা। ওরাই ছিল গোলা ছুট আর এক্সা-দোকান সখী। ছয়-সাত বছর বয়সে, সেই যে তার এ পাড়া ও পাড়ায় অবাধ আনাগোনা শুরু, পঁচাত্তরে পৌঁছেও তা চলছে সমান তালে।

ভয়হীন, লাজ-লজ্জাহীন ভাবে। সময়ে এ শহরে এসেছে আরও অনেক নতুন মানুষ। বসতি বেঁধেছে টুংকার পাড়ায়। তবে এ সময়ে হারিয়েছেও অনেক আপনজন।

সাতচল্লিশে হারায় ঝুমুরদের। ভেবেছে লুকোচুরি খেলার মত কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়েছে ঝুমুর। আজ ঝুমঝুম করে নূপুর পায়ের শব্দ নেই কোথাও। খুঁজেছে সকাল-দুপুর। কিন্তু সেই যে লুকালো, ফিরে এলো না আর। ঝুমুরের পরিবর্তে পেল নতুন মুখ - ফাতেমা ও আয়েশা। তাতেই খুশী। সেদিন বুঝেনি কোথায় লুকায় ঝুমুর! দীর্ঘদিনের এ লুকনোর কারণ উদঘাটনে টুংকার লাগে দীর্ঘ সময়। তারপরও, বুঝেও বোঝাতে পারিনি নিজেকে। কেন এপার-ওপার করতে হয় ফাতেমা-ঝুমুরকে?

এর পর পঁয়ষট্টিতে হারায় দত্ত বাড়ির গৌরীকে। কত খেলেছে একসাথে, সেই ছোট্ট বেলা থেকে। বেলা ফুরিয়ে যেত, তবু ওদের খেলা শেষ হতো না। খেলতে খেলতেই বড় হয়; দুজনের বিয়ে হয় দু এক বছরের ব্যবধানে। টুংকা-গৌরী সংসার বেঁধেছে পাশাপাশি আঙ্গিনায়। ছেলে মেয়ে স্বামী-সংসার নিয়ে ভালই ছিল ওরা। টুংকার বড় ছেলে আর গৌরীর মেঝ ছেলে সমীর পাশাপাশি বয়সের। ওরা স্কুলে যেত এক সাথে। স্কুলের পথে টানা সড়কে যত দূর দেখা যায়, টুংকা বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতো; আর বলতো - 'দেখে দেখে যেও। রাস্তার বা দিক দিয়ে যেও। অচেনা কারও সাথে কথা বলো না কিন্তু।' এত বছর পর টুংকা যখন এলিজাবেথ সড়কে কনকনে শীতে প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে যায়, আজ তাকেও শুনতে হয় - 'সিঁড়ি দেখে দেখে নেমা দেখে যেও। দেখে দেখে ফুটপাথের বা'দিক দিয়ে হেটো'। এভাবেই হয়তো সংসারের ভোল পালটায়, বদলায় জীবনের রোল! একদিন সন্তানদের জন্য যা যা করেছে, আজ তার জন্য সন্তানদের একই ভাবনা। 'ঠাঞ্জা লাগিও না; সকালে ওমুখ খেয়েছ? গরম দুধ খেতে ভুল না কিন্তু! এই যে এখানে থাকলো'। আরও কত কিছু শিখতে হচ্ছে। যেভাবে হাটি-হাটি পা-পা করে একদিন সন্তানদের শিখিয়েছে; আজ তাকেই শিখতে হচ্ছে অনেকটা হাটি-হাটি পা-পা করে।

হঠাৎ এলো পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ। সাতদিনের এ যুদ্ধ শেষ হয় সোভিয়েত রা'শার মধ্যস্থতায় আইয়ুব-শাস্ত্রীর তাসখন্দের চুক্তির মাঝে। যুদ্ধে কে জয়ী হয় তা সঠিক করে বলা কঠিন। তবে যা সত্য, তা হচ্ছে, এ যুদ্ধের পুরো সময়টাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত রয়ে যায় প্রায় অরক্ষিত। সেদিন পুলিশ আর ই পি আরই ছিল ভরসা। কিন্তু কেন? অন্যান্যদের মত বিষয়টা টুংকাকেও ভাবায়। তবে তার ভাবনা, ভাবনাই থেকে যায়। স্বামী-সংসার নিয়েই সারাদিন যায়। এর পরপরই সভা-সমিতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরে স্থানীয় রাজনীতিকরা। টুংকার আজ সঠিক স্মরণ নেই, তবে যত দূর তার মনে পরে, এর পরপরই আসে ছয় দফা। সংসারে আপনজনদের এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছে। কিন্তু বোঝার চেষ্টাও করেনি কখনো; আর বুঝেওনি কিছু। তবে শহরের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো পোষ্টারে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের তালিকা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। শুধু টুংকা নয়; টুংকার মত সবাই বুঝেছিল। সেদিনের রাজনীতিকরা অর্ধ-ডজন কঠিন কঠিন দফার সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাতে পারতো সাধারণ মানুষকে। আজকাল প্রগতিশীল রাজনীতিকরা তাদের সাফল্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতেও হিমসিম খায়।

যুদ্ধের অল্পদিন পর গৌরীর সপরিবারে কোলকাতায় বেড়াতে যায়। ওদের জন্য অবশ্য এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও ওরা বেড়াতে যায়। তারপর, এক মাস

যায়। দু মাস যায়। কিন্তু গৌরীরা ফিরে না। ছ'মাসের মাথায় গৌরীর একটা চিঠি আসে। অল্প কয়েকটি কথায় ছোট্ট একটি চিঠি। টুংকা বার বার পড়ে। বুকটা ফেটে যায়; রাগ আর অভিমানো। 'জীবনের কি এই মানে? কাঁদে আর বলে - একবার বলে গেল না। বলে যেতে কি পারতো না? এত মায়া, ভালবাসার কি কোনই মূল্য নেই?' ধীরে ধীরে সামলে নেয় টুংকা নিজেকে। বোঝার চেষ্টা করে বাস্তবতার আলোকে। তবু তার প্রশ্ন - 'বাস্তবতা কেন এত নিষ্ঠুর?' ছবির মত ভেসে উঠে ওদের জীবনের খুঁটি-নাটি সব ঘটনা। মনে পরে গৌরীর সাথে ছবি দেখার কথা। সেই কালী সিনেমায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অনেকটা বগলদাবা করেই নিয়ে যেত। 'শহরের ইতিকথা, সবার উপরে, হারানো সুর, সাগরিকা', আরও কত ছবি। উত্তম-সুচিত্রা ছিল ওদের প্রাণের জুটি। খাটি বাঙ্গালি মননে গাথা। ছবিতে সমাজ-সংসারের নিষ্ঠুরতায় ভালবাসার বিয়োগে ওরা কাঁদতো। শেষে মিলনের আনন্দেও আবার কাঁদতো। পঁয়ষাটের যুদ্ধের পর গৌরীরাও ওপারে গেল আর উত্তম-সুচিত্রার আসা বন্ধ হল। ওদের স্থলে এলো জেবা-মোহাম্মদ আলী। তবে, টুংকাকে তেমন টানতো না। কারণ শুধুই ফিজিক্যাল দূরত্ব নয়, সিনেমার মূল বিষয়বস্তুর মানসিক দূরত্বটাই ছিল বড়।

টুংকাকে টিচ করার দায়িত্বটা যেন শুধুই সন্তানদের নয় - উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া এ যেন নাতনিদেরও দায়িত্ব। টুংকা যেন গবেষণার গিনিপিগ। 'এটা খাও, ভাল হবে। এটা খাবে না, রক্তের চাপ বেড়ে যাবে। দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবে'। কি করবে আর কি করবে না, এই নিয়েই সবার ভাবনা। একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে কনকনে শীতে এলিজাবেথ সড়ক ধরে দিদাকে হাটতে দেখে নাতনি বলে - 'দিদা তুমি কাল থেকে জিনস পড়ে হাঁটবে; তাতে শীত কম লাগবে'। দিদা বলে - 'তাই হবে। যে দেশের যে বাও, উদ্ভা করে নৌকা বাও'। তারপর উচ্চস্বরে দুজনেই হাসে। নাতনি হাসে জিনসে ড্রাভিডিয়ান দিদাকে কেমন দেখাবে তা ভেবে। আর টুংকা হাসে, লালনের ছন্দে বলা চরণ দুটির নাতনি যে কিছুই বুঝেনি তা ভেবে। তারপর দুজন দু'পথে হাটে।

একাত্তর যে হঠাৎ করে আসে - মোটেই তা নয়। গণরায়ের অস্বীকৃতি; শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী মিশিল; অসহযোগ আন্দোলন এবং 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'এর পর নেমে আসে বর্বরতা। এ এক নজির বিহীন বর্বরতা। কেউ রেহাই পায়নি। এবার শুধুই ঝুমুর, গৌরীদের যেতে হয়নি, পাড় হয়ে ওপারে যেতে হয়েছে টুংকাকেও। শোষণের যেমন কোন জাত নেই, তেমন তাদের শোষণের। সাতদিন-সাতরাত লাগে উজান ঠেলে ময়মনসিংহ-মেঘালয়ের সীমান্ত গ্রাম মানকারচর পৌঁছাতে। সেখান থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ শিবিরে। শুনেছে চন্দনারাও প্রাণে বেঁচে এদিকেই এসেছে। তবে দেখা হয়নি কখনো। জানে গৌরীরা কোলকাতায় থাকে। সুযোগ-সামর্থ্যের অভাবে দেখা হয়নি তখন। সত্যি বলতে কি, ঝুমুর, চন্দনা বা গৌরী, ওদের কারও সাথেই টুংকার দেখা হয়নি আর কোনদিন।

টুংকা এখন টাঙ্গাইলে। গত ষাট-পঁয়ষাট বছরে কতখানি বদলে গেছে এ শহর! সেই কালী সিনেমা আর নেই, যেখানে উত্তম-সুচিত্রা বিয়োগের বেদনায় আর মিলনের আনন্দে দর্শকদের সমান ভাবে কাঁদতো। সেখানে এখন বহু তলা শপিং মল। ভানু কর্মকারের কথা মনে হলে, মেথী-হারের কথা মনে পড়ে। কোলকাতার রঙ্গিন ক্যাটালগ দেখে টুংকা-গৌরী গড়েছিল একজোড়া মেথী-হার। ভানুচন্দ্র আর নেই। টুংকার মেথী-হার এখন নাতির ঘরে পুতির গলায়।

আর সেই পাশের বাসার গৌর বসাক? যার নিপুণ হাতে, কাঠে কাঠে খট্ খট্ শব্দের তাঁতে তৈরি হত শাড়ির থান। গৌরীদের বাড়ি হস্তান্তর হয় এক হাত থেকে অন্য হাতে। তারপর অজানা বহু হাতের হাতাহাতিতে ছিন্নভিন্ন গৌরীর বাড়ির সীমানা। এত অচেনা বাড়ির ভিড়ে, টুংকার নিজের এত বছরের পৈত্রিক সূত্রের তিল-তিল করে সাজানো বাড়িও কেন যেন আজ অচেনা মনে হয় তার কাছে। মনে পরে, এ উঠানের ডাক, গৌরী তার উঠান থেকে শুনতে পেত। এখন শুধুই দেয়াল - দেয়ালের পর দেয়াল। গৌরীর জাত থেকেও জাত ছিল না। জাত ছিল না তার রান্নাঘর সংলগ্ন তুলসী গাছের। টুংকার ইচ্ছে হলেই, পাতা ছিঁড়ে ঘ্রাণ নিতো। অন্যান্য কামরার মত গৌরীর সরস্বতীর ঘরও ছিল টুংকার জন্য উন্মুক্ত। সরস্বতীর জাত থাকলেও, গৌরীর সরস্বতীর জাত ছিল না। এখন একই জাতের হয়েও টুংকার মনে হয় সবাই কেমন যেন ভিন্ন জাতের। এখন কিছুই আর চেনা যায় না; সাদা-কালোয় বোঝা বরই দুষ্কর। চারিদিকে অসংখ্য চেনা জাতের হয়েও মনে হয় ভিন্ন জাতের মানুষের ভিড়। এরই মাঝেই টুংকা হাঁটে ভয়হীন, লাজ-লজ্জাহীন ভাবে যার যাত্রা সেই ছয়-সাত বছর বয়সে। বাসা থেকে বেড় হয়ে টুংকা হাঁটে। সোজা দেড়-মাইল হাঁটলেই টাঙ্গাইল শাড়ির বাজিতপুর হাট। অবশ্য সেখানে আজ আর তেমন কোন জৌলুস নেই। টুংকা হাঁটে উত্তর-দক্ষিণে। একবার যায় আর একবার আসে। এখন তার মাথায় স্কি টুপি নেই। পায়ে মোজাও নেই। নাতিদীর্ঘ গ্রীবা তার উন্মুক্ত। এখন শুধুই কোমরে গোজা সবুজ জমিনে চিকন লাল পেড়ে টাঙ্গাইল শাড়ি। এ পোষাকে বাজিতপুর সড়কের ক্যাট-ওয়াকে সে হাটে অন্য আর এক ধরনের মডেল রূপে।

সেদিন হঠাৎ অসময়ে ফোন। তুলেই শুনি টুংকার কণ্ঠ। এই অসময়ে? কোন রকম ভূমিকা রেখে বলে - ‘খবর রাখো? বাজিতপুরের কারিগরেরা আজ উগ্রপন্থীদের বর্বরতার স্বীকার। সরস্বতীর ঘর ভেঙ্গে একাকার। এপারে ওদের থাকা এখন কঠিন। বুদ্ধি, মূল-উপরে যাওয়াটা সহজ নয়, তবে প্রাণ বাঁচাতে অন্য আর কি উপায়?’ তারপর দীর্ঘ নীরবতা। উত্তরে কি বলবো, ভাবতে ভাবতেই, এক সময় ফোনটা কেটে যায়। তাৎক্ষণিক, টুংকাকে ফোন রিটার্ন করার তাগিদ অনুভব করি না। হারিয়ে যাই শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি তন্ময়তায়; সেই সময়ে যেমনি করে ‘টুংকা’ - আমার মা, আমার চেতনাবোধকে জাগ্রত করতো, তেমনি করেই আজ তার সহজ সরল প্রশ্নবাণে আবার আমার চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেল। জানালার বাইরে হেমন্তের নীল আকাশের অসীমে তাকিয়ে শুধু ভাবি - ‘টিচিং টুংকা; নাকি, ইয়েট, লট্ টু লার্ন ফ্রম টুংকা’।